613

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ JUL 1 1999
পৃঃ ৬ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিশেষ সং

আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ আলী আহসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিরকাল আমাদের আকর্ষণের ছিল। স্কুলে থাকতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমার আগ্রহ জন্মে। ভাবতাম একদিন আমি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করব এবং সেইদিন আমার জন্য কত না আনন্দের হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি আমার একটি প্রচণ্ড সম্ভ্রমবোধ ছিল। মরহুম শহীদুল্লাহ সাহেবের নাম শুনতাম এবং সকলের কাছে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পেতাম। ইংরেজীর অধ্যাপক ডঃ মাহমুদ হাসান অত্যন্ত সুন্দর এবং সজীব পুরুষ ছিলেন। আমাদের স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীতে তিনি একবার এসেছিলেন। আমরা জানতাম যে, তিনি উর্দুভাষী। কিন্তু অবাক হলাম, যখন তিনি আমাদের সঙ্গে সুন্দর বাংলায় কথা বললেন। আরবীর অধ্যাপক মোয়াজ্জম হোসাইন আমার বাবার সহপাঠী ছিলেন। তিনি কখনও কখনও আমাদের বাসায় আসতেন। বাবার সঙ্গে যখন কথা বলতেন তখন আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা শুনতাম। সে সময় একজন জার্মান অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে ছিলেন। তাঁর নাম জে ডব্লিউ ফুক। আমরা ছাত্ররা নীলক্ষেতে তাঁর বাড়ীর কাছে ঘোরাঘুরি করতাম। তিনি আমাদের দেখে হাসিমুখে এগিয়ে আসতেন। দীর্ঘদেহী হালকা ধরনের মানুষ ফুক ঢাকার শিক্ষিতজনের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

১৯৪০ সালে যখন সত্যিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলাম ছাত্র হিসেবে, তখন একটি বিপুল পরিধিতে পড়লাম বলে মনে হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করলাম যখন, তখন মনে হল আমার সামনে অলৌকিকের দরজা খুলে গেছে। চতুর্দিকে কত ছেলের আনাগোনা। অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ এবং কখনও শিক্ষকদের গম্ভীর পদক্ষেপ– সব কিছু আমাকে শিহরিত করত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে প্রবেশের পর থেকে চার বছর পর্যন্ত আমার সাহিত্যকর্মের সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। আমার লেখা বেরোতো মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত এবং নবযুগ-এ। 'শ্রী হর্ষ' বলে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বেরোতো কলিকাতা থেকে। সেখানেও আমার লেখা ছাপা হত। এসব কিছুকে অতিক্রম করে আমার একটি লেখা যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশ পেল তখন আমার মনে হল আমি যেন আকাশে উঠেছি। 'পরিচয়' সে সময় সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত পত্রিকা ছিল। এ পত্রিকায় যাদের লেখা বেরোতো তারা সকলেই বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবল সম্মানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমার লেখাটা ছিল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার ওপর। ভয়ে ভয়ে লেখাটি যখন মোহিতলাল মজুমদারকে দেখিয়েছিলাম তখন তিনি আমার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। 'নবযুগ'-এ আমার একটি লেখা বেরিয়েছিল পার্ল বাক-এর উপন্যাসের ওপর। আমার ইংরেজী শিক্ষক পিকে গুহ একদিন আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে দূর থেকে ডাকলেন। কাছে যেতেই পিঠে হাত রেখে বললেন, 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত পার্ল বাকের উপন্যাসের ওপর তোমার লেখাটি আমার ভাল লেগেছে। মাঝে মাঝেই আমি নীলক্ষেতে মোহিতলাল মজুমদারের বাসায় যেতাম। সেখানে তিনি কখনও কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন আবার কখনও গদ্য রচনাও পাঠ করতেন। আবার কোন কোন দিন আমাকে একজন মুগ্ধ তোতা পেয়ে সাহিত্যের নানা বিষয়ে কথা বলতেন।

সাহিত্যের সঙ্গে এভাবে আমার একটি গভীর যোগসূত্র গড়ে ওঠে। আমি আজো মনে করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে আমার চারটি বছর আমার জীবনকে মর্যাদায় মণ্ডিত করেছে। আমি মাঝে মাঝে কলিকাতায় যেতাম। সেখানেই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম এবং তাঁর স্নেহ ও আশ্বাস পেতাম। প্রেমেন্দ্র মিত্র সে সময় 'নিরুক্ত' বলে একটি কবিতা পত্রিকা বের করতেন। উক্ত পত্রিকায় তিনি আমার কবিতা ছেপেছিলেন। আমার ছাত্রজীবনের গণ্ডিত তখনও আমি পেরোয়নি, কিন্তু সে বয়সেই প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের পাশাপাশি বসবার অধিকার অর্জন করেছিলাম। এ জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন পরিবেশের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগত যে পরিবেশ ছিল, সুশৃঙ্খলার যে একটি বিস্তার ছিল এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের আবেশ ছিল– এতে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন ঢাকা শহরে প্রগতি লেখক সংঘ সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সংঘের নিয়মিত মাসিক সভায় আমি যেতাম এবং কখনও কখনও বক্তৃতাও করতাম। প্রগতি লেখক সংঘের সাথে আমার যোগসূত্র ঘটে কবি কিরণশংকর সেনগুপ্তের মাধ্যমে। কিরণশংকর আমার এক ক্লাস ওপরে পড়তেন। তার পিতা বিজয়শংকর সেনগুপ্ত ঢাকা কলেজে আমার ভূগোলের শিক্ষক ছিলেন। সেই সুবাদে তাদের নবাবপুরের বাসায় প্রায়ই যেতাম। এভাবে কিরন শংকরের সঙ্গে আমার একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে ওঠে। প্রগতি লেখক সংঘে যখন যাতায়াত করি তখনই এম এন রায়ের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। প্রাণগোপাল এবং জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা আমাকে এম এন রায়ের বৃত্তের মধ্যে নিয়ে এলেন। আমি কিরন শংকরের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করিনি, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এম এন রায়ের বৃত্তের মধ্যে চলে এসেছিলাম। এর আর একটা কারণ ছিল। তখন পাকিস্তান আন্দোলন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এম এন রায়ের দল এ আন্দোলনে রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছিল।

এ সময় ঢাকায় আমরা আইরিশ লিটারেরী রিভাইবাল নিয়ে পড়াশুনা করেছি। আমার খালাতো ভাই সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন ইংরেজী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বসে আইরিশ রিভাইবাল নিয়ে আলোচনা করতাম। এ আলোচনার জের ধরে আমরা পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠন করি। তখন কলিকাতায় আজাদ অফিসে পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির জন্ম হয়েছিল। সে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মুজিবর রহমান খাঁ এবং আবুল মনসুর আহমদ। আমাদের সাহিত্য সংসদ রেনেসাঁর অঙ্গসংগঠন ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে আমরা তিনটি সম্মেলন করেছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম ঐতিহ্যকে উদ্ভাসন করা, লোকসাহিত্যকে পুনর্জীবিত করা, পুঁথি ও লোককাহিনী অবলম্বনে কাব্য কাহিনী রচনা করা এবং আমাদের প্রাত্যহিক সমাজ জীবনকে অবলম্বন করে গল্প-উপন্যাস রচনা করা। মূল উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্য ক্ষেত্রে আমাদের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। যদিও সাহিত্য সংসদ এখন আর নেই এবং রেনেসাঁও নেই। কিন্তু আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এ দু'টি সংগঠন যে স্বাক্ষর রেখে গেছে, তা মুছে যাবার নয়।

এ সময়ের মধ্যেই সারা বাংলাদেশে মুসলিম লীগ নতুন জীবন পায় মরহুম আবুল হাশেমের পরিচালনায়। আবুল হাশেম একপর্যায়ে ঢাকায় এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আবুল হাশেম মুসলিম লীগের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। আমরা ছাত্ররা তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঢাকায় আশপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছি এবং বক্তৃতা করেছি। আমি এবং শামসুল হক– আমরা দু'জন নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা করেছিলাম– মনে আছে।

একটি পত্রিকা প্রকাশনার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি পাক্ষিক পত্রিকা আমরা প্রকাশ করতাম। আমাদের একটি গোষ্ঠী ছিল। এতে যারা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, মরহুম মাজহারুল হক, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, আমি, কে এম আহসান এবং সাইফুল্লাহ। পশ্চাদে প্রেরণাস্বরূপ কাজ করেছেন মরহুম ফজলুর রহমান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশটি এই চার বছর সময়কালের মধ্যে ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ চরমে ওঠে। এর ফলে নাজিব আহমদ নামে একজন ছাত্রনেতা নিহত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, হিন্দুদের থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছি। হিন্দু শিক্ষকরাও আমাদের তেমন মমতার সঙ্গে গ্রহণ করছেন না। নাজির আহমদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ১৯৪৪ কিংবা ৪৫ সালে আমার সম্পাদনায় নাজির আহমদ নামক একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে মুসলমান ছাত্ররা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে একটি প্রবল প্রতিবাদী কণ্ঠ। আমরা পাকিস্তানবিরোধী চক্রের সঙ্গে কখনও সমঝোতায় আসিনি। হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে সঙ্গে নিয়ে এ কে ফজলুল হক যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন, সে মন্ত্রিসভায় ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহ বাহাদুর যোগ দিয়েছিলেন। নবাব বাহাদুর মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে যখন ঢাকায় আসেন, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে তাঁকে কালো পতাকা দেখিয়েছিল। আমরা সুষ্ঠুভাবে প্রতিবাদ জানাতে পারিনি। কেননা, নবাববাড়ীর পক্ষের লোকেরা আমাদের মারপিঠ করে এবং স্টেশন থেকে তাড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানের পক্ষে যে আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে, সে আন্দোলনকে রূপ দেয় এবং মূল্য দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা।

আমার সময়ে অর্থাৎ আমি যখন ছাত্র ছিলাম, সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান আন্দোলনকে সামনে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সে সময় আমাদের লক্ষ্য ছিল হিন্দু জমিদার এবং মহাজনদের শোষণ থেকে মুক্তি। আমাদের দাবী ছিল– মুসলমানরা তাদের সংখ্যানুপাতে চাকরির অধিকার পাবে। আমাদের দাবী ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা, অর্থনীতি ক্ষেত্রে এতদিন যে বঞ্চনায় আমরা ভুগছিলাম সে বঞ্চনা থেকে মুক্তি। তখন প্রবল একটি আবেগ ছিল। যে আবেগটি ছিল বন্যাবেগের মত। এই ইতিহাসটি মুছে ফেলার নয়। যে প্রতিবাদের কণ্ঠ তখন আমরা পেয়েছিলাম, সে প্রতিবাদের কণ্ঠ সমগ্র পাকিস্তান আমলে আর নিশ্চুপ হয়নি। পাকিস্তান আমলেও আমরা প্রতিবাদকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। তাই যখনই দুঃশাসন দেখেছি, তখনই আমরা প্রতিবাদ করেছি এবং অসহযোগ করেছি। একুশের ভাষা আন্দোলন আমাদের প্রতিবাদের প্রথম উচ্চরোল। তারপর মুক্তিযুদ্ধ এল। আমরা আমাদের নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিপুল সংগ্রামে লিপ্ত হলাম। এখন আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের বিশ্বাস নিয়ে, যে বিশ্বাস আমাদের চৈতন্যোদয়ের পটভূমি হবে।

লেখক ঃ কবি, জাতীয় অধ্যাপক, ভাইস চ্যান্সেলর, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

৭৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

সংখ্যা ১৯৯৯

১৯২১ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পথ পরিক্রমা শুরু করে। যাত্রাকালে, ১৯১৭ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কথায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ছিল "মুসলিম জনসমষ্টির উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবীর স্বীকৃতি, এবং পূর্ববাংলায় মুসলিম জনসমষ্টিই ছিল সংখ্যাগরিষ্ট" The desire to accede to the demand for further facilities for the muslim population who form a vast majority in Eastern bengal পূর্ব বাংলার জনগণের শিক্ষা এবং শিক্ষার মাধ্যমে সমৃদ্ধির সরল রাজপথ হিসেবে বরাবর চিহ্নিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯০৫, সালের বঙ্গভঙ্গে পূর্ব বাংলার অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির যে সূচনা হয়, মাত্র কবছরে কলিকাতাকেন্দ্রিক 'ভদ্রলোক'দের

...য় ঃ কার্জন হল

আন্দোলনের তীব্রতায় এবং দেশব্যাপী সন্ত্রাসের ব্যাপক বিস্তারের ফলে তার অবসান ঘটে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বরে দিল্লী দরবারে।

১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের এই ক্ষুদ্র পরিসরে পূর্ব বাংলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়, লর্ড হার্ডিঞ্জ (Lord Hardinge) নিজেই তার বিবরণ দিয়ে বলেছেন, ১৯০৬ সালে কলেজ পর্যায়ে পূর্ব বাংলা ও আসামে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬৯৮। এবং এ লক্ষ্যে ব্যয়িত হয় ১৫৪৩৫৮ (এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার তিনশত আটান্ন) টাকা। ১৯১১ সালে ঐ সব কলেজে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫৬০ জন এবং এ লক্ষ্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩,৮৩,৬১৯ (তিন লক্ষ তিরাশি হাজার ছয় শত উনিশ) টাকা। শুধু কলেজ পর্যায়ে কেন, মাধ্যমিক পর্যায়েও এ সময়ে ছাত্র সংখ্যা ও শিক্ষা খাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় প্রচুর পরিমাণে। ১৯০৫-১৯১১ সময়কালে সরকারী প্রতিষ্ঠানে এই এলাকার মুসলিম ছাত্রসংখ্যা ৬৯৯০৫১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯৩৬৬৫৩ জন এবং শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায় ১১,০৬৫১০ টাকা থেকে ২২,০৫,৩৩৯ টাকা। প্রাথমিক পর্যায়েও শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি পায় ঐ সময়ে ৪৭,৮১,৮৩৩ টাকা থেকে ৭৩,০৫,২৬০ টাকায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই বঙ্গভঙ্গ রদের খেসারত বা ক্ষতিপূরণ (Compensation) স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকায়। ১৯২২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে চ্যান্সেলর হিসেবে লর্ড লিটন (Lord Lytton) বলেন, "পূর্ববঙ্গের এক সময়ের রাজধানী হিসেবে ঢাকার বর্তমান অবনত অবস্থা মনে রাখার এবং 'অপূর্ব রাজকীয় ক্ষতিপূরণ' (Splendid imperial compensation) রূপে স্যার রবার্ট ন্যাথান (Sir Robert Nathen) ও তাঁর কমিশনে কিভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন প্রকল্প প্রণয়ন করেন, তা মনে রাখার আর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি পরামর্শ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে এবং তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার দিকে তাকাতে"। সমাবর্তন ভাষণে তিনি বলেন, "আমি জনগণের সামনে পূর্বেই বলেছি, আমার মতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। অন্যসব কিছুর চেয়ে বাংলার, এমনকি ভারতের বাইরেও, ঢাকার গৌরব বৃদ্ধি ও প্রচারে তা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে" I have already stated in public that in my opinion this university is Dhaka's greatest possession, and will do more than anything else to increse and spread the fame of Dhaka beyond the limits of Bengal of or India itself) ঢাকা বিশ্ববিদ্যঅলয় বিভিন্নভাবে পূর্ব বাংলার জনসমষ্টির আশাআকাঙ্খা ধারণ করে এককালের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকাকে জাতীয় রাজধানীর পর্যায়ে উন্নীত করতে যথার্থ ভূমিকা পালন করেছে। আজকে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ পর্যায়ে অবনমিত হল কেন? কিভাবে? এর জবাব খুঁজে পেতে হলে আরও পেছনে যেতে হবে। কেন এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল? বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারীদের কোন্ কোন্ সংকটের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে তাও জানা দরকার।

পূর্ব বাংলার জনগণ, বিশেষ করে মুসলিম জনসমষ্টি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন প্রধানত দুটি কারণে। ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যেমন সৃষ্টি হবে সম্ভাবনাময় নতুন নতুন সুযোগ, শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে তেমনি সৃষ্টি হবে বিরাট জনগোষ্ঠীর পার্থিব সমৃদ্ধির সহস্র বাতায়ন। অন্যদিকে, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পক্ষেত্রে এতদিন পূর্ববঙ্গ কলিকাতার বিস্তীর্ণ চারণভূমি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে তার অবসান ঘটবে। কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, নতুন নতুন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হবে। বঙ্গভঙ্গের সময় অবিভক্ত বঙ্গদেশে যে ৪৫টি কলেজ ছিল, তার ৩০টিই ছিল পশ্চিমবঙ্গে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে অবস্থিত ছিল মাত্র ১৫টি কলেজ, যদিও এই এলাকার জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা থেকে অনেক বেশী ছিল। পূর্ববঙ্গের কলেজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বরিশালের বিএম কলেজ (১৮৮৯), চট্টগ্রাম কলেজ (১৮৬৯), কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৬৯), ঢাকা কলেজ (১৮৪১), জগন্নাথ কলেজ (১৮৮৪), দৌলতপুরের হিন্দু একাডেমী (১৮৮৬), নড়াইলের ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৮৬), পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ (১৮৯৮), এবং রাজশাহী কলেজ (১৮৭৩)। আসামে ছিল মাত্র দুটি কলেজ– সিলেটের এমসি কলেজ (১৮৬৩) এবং গৌহাটির কটন কলেজ (১৮৯৮)। শুধুমাত্র কলিকাতায় ছিল ১৩টি কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মত ৭টি পেশাদারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপূর্ব বাংলার জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (হান্টার কমিশন) পূর্ববঙ্গে মুসলিমদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার যেসব কারণ বিবৃত করেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সাথে তাও স্মরণযোগ্য। কমিশনের মতে যে সব কারণ এজন্য দায়ী তার মধ্যে জাতি হিসেবে মুসলমানদের তীক্ষ্ণ আত্মসচেনতা, অতীত উৎকর্ষের স্মৃতি, পাশ্চাত্য শিক্ষায় ধর্মীয়বোধপ্রসূত অনীহা এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি গভীর আকর্ষণ।

পরবর্তীকালের হরনেল কমিটি (The Hornell Committee) প্রায় অনুরূপ কারণের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এই কমিটির মতে, মুসলমানদের দারিদ্র্য, ভাষায় অদক্ষতা, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অধিক আকর্ষণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের যথার্থ প্রতিনিধিত্বের অভাব ছিল উল্লেখযোগ্য কারণ। এ প্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট অভিনন্দনযোগ্য এক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে পূর্ব বাংলার অগ্রসরমাণ মুসলিম জাতি ভয়ঙ্কর মুষড়ে পড়ে। হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন মুসলিম নেতৃবৃন্দ, অন্য কোন কারণে না হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে যে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল, তা মন্থর হয়ে পড়বে এ আশঙ্কায়। বৃটিশ সরকার তা অনুধাবন করেন। তাই পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আশ্বাসের বাণী শোনাতে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ পূর্ববঙ্গে এক সরকারী সফরে আসেন। তিনি ঢাকায় এলে ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী মুসলিম নেতৃবর্গের এক ডেলিগেশন গভর্নর জেনারেলের সাথে সাক্ষাৎ করে, মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবিদাওয়া তুলে ধরেন। এই ডেলিগেশনে যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগন্য ছিলেন স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, একে ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবর্গ। তাঁরা বলেন, "বঙ্গভঙ্গের সময়ে পূর্ববঙ্গ ছিল অত্যন্ত অবহেলিত এক এলাকা। ফলে মুসলমানরাই ছিলেন সবচেয়ে বঞ্চিত। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বঞ্চনা ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক।" নতুন প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের নতুন উদ্যোগ গৃহীত হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ হলে সে সম্ভবনাও বিনষ্ট হল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিমাতাসুলভ আচরণ এবং সরকারী ঔদাসীন্যের ফলেই পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে এতো পশ্চাৎপদ। তাই এর প্রতিনিধানের লক্ষ্যে তাঁরা ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোর দাবি জানান। লর্ড হার্ডিঞ্জ মুসলিম প্রতিনিধিদের দলের বক্তব্য ধৈর্যসহকারে শোনেন এবং প্রতিনিধি দলের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে তাদের বলেন, "সত্য শিক্ষাই কোন জাতিকে পশ্চাদপদতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।" তিনি আশ্বাস দেন অবিলম্বে ভারত সচিবের নিকট ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সুপারিশ করবেন।

সুপারিশ তিনি সত্যিই করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতৃবৃন্দ কিন্তু বঙ্গভঙ্গের খেসারত হিসেবে গ্রহণ করেননি, তারা বরং এটিকে দেখেছেন শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর মুসলিম সমাজের শিক্ষার স্বর্ণালী সোপানস্বরূপ। এই দাবী ছিল এই এলাকার জনসমষ্টির প্রাণের দাবী

ইতিহাসের বিস্মৃত এক অধ্যায়

এমাজউদ্দীন আহমদ